প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৬
প্রচ্ছদশিল্পী : নিতিশ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী. ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯
মুদ্রক : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

সূচীপত্র

কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ: পাবলো নেরুদার কবিতা গুচ্ছ; এই ভাই; নাজিম হিকমতের কবিতা; দিন আসবে; চিরকুট; পদাতিক, যত দূরেই যাই; কাব্য সংগ্রহ (১ম ও ২য়)।

অনুবাদকের কথা

ওলঝাস সুলেমেনভের সঙ্গে আমার গত বছর প্রথম আলাপ। মস্কোয়। সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের একজন কর্মকর্তা মারিয়াম সালগানিকের কাছে আগেই ওলঝাসের লেখার প্রশংসা শুনেছিলাম। কিন্তু ওর লেখার ইংরেজি অনুবাদ পেয়েছি অনেক পরে। কবিতারও আগে আমার দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল মানুষটাকে। গলা ফাটিয়ে হাসে, ধারালো বুদ্ধি, সূক্ষ্ম রসবোধ, সেইসঙ্গে অসম্ভব ফুর্তিবাজ।

এরপর আলমাআতায় সম্মেলনের সময় দেখলাম ওলঝাসের অন্য চেহারা। রাতের পর রাত ঘুমোয় নি। এক ফোঁটা মদ ছোঁয় নি। অক্লান্ত-ভাবে খেটে গেছে।

অল্প কিছুদিন আগে মারিয়াম আমাকে ওলঝাসের কবিতার ইংরেজি অনুবাদগুলো পাঠিয়ে দেন। প'ড়ে আমার এত ভাল লাগে যে, তখনই তর্জমা করতে ব'সে যাই। অনুবাদগুলো যদি পাঠকদের ভাল লাগে তাহলে বুঝব আমার ভাল লাগা সার্থক হয়েছে।

অনুবাদকের একটা ছুটো অসুবিধার কথা শুধু জানিয়ে রাখি। ইংরেজি প'ড়ে মনে হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় বোধহয় ভাবের ঠিক সুষ্ঠু প্রকাশ হয় নি। স্থান কিংবা ব্যক্তির নামেও অনুবাদকের অজ্ঞতাজনিত কিছু কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। এরপর সুযোগ পেলেই এইসব ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করব।

ব্রজকিশোর মণ্ডলের উৎসাহ না পেলে এ বাজারে এ বই বার হত কিনা সন্দেহ। সুতরাং তাঁকে ধন্যবাদ না দিলে অকৃতজ্ঞতা হবে।

সু. মু.

কবির নিজের কথা

আমার নাম ওলঝাস ওমর-উলি সুলেমেনভ।

কাজাখ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী আলমা-আতায় ১৯৩৬ সালে আমার জন্ম।

পিতা : ওমর। অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার ছিলেন। আমার জন্মের মাত্র কয়েকদিন আগে বাবা মারা যান।

মা : ফতিমা। কয়েক বছর পরে তিনি নাম-করা কাজাখ সাংবাদিক আবুদ আলিকে বিবাহ করেন। আমি তাঁর কাছেই মানুষ।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ ক'রে বেরিয়ে আমি কাজাখ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হই। পড়া শেষ করে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি তেল আর গ্যাস সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কাজে ঢুকি। ভূতাত্ত্বিক হিসেবে আমি বেশ কয়েক বছর কাজ করি। ছাত্রাবস্থায় স্থানীয় পত্রপত্রিকায় মাঝেমধ্যে লিখেছি। পরে মস্কোতে গিয়ে সাহিত্যে তালিম নেওয়ার একটা সুযোগ জুটে গেল। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস তো আমার আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল, মস্কোতে গিয়ে পড়াশুনো করবার সময় আমি চেষ্টা করলাম মানুষজাতির কী ইতিহাস তা জানতে।

আমি প্রথম যে কবিতাগুলো লিখি তার ভেতর দিয়ে আমি বুঝতে চেষ্টা করি কাজাখ জাতির অতীত ইতিহাস। কাজাখরা হল তুর্কীদের থেকে উদ্ভূত শেষ যাযাবরের জাত। তারা বরাবর থেকেছে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মাঝখানে। আমাদের সাবেকী আর আধুনিক সংস্কৃতিতে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার ছাপ মিলবে। প্রাচীন তুর্কীদের গোঁড়ামি, বৌদ্ধদের ধ্যানশীলতা, মুসলমানদের নৈর্ব্যক্তিকতা আর ইউরোপীয়দের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—এ সমস্তই আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত।

আমি ইতিহাসপ্রেমিক। প্রাচীনদের ইতিহাসের মধ্যে আমি সেই অস্তিবাচক উৎস খুঁজছি যা মহাফেজখানার নথীপত্রের মধ্যে ধ'রে রাখা হয় নি, কিন্তু যে উৎস ছাড়া একই মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের সমসাময়িক আর ভাবীকালের সম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

অলিখিত ইতিবৃত্ত, লুপ্ত ইতিকথা আর কাব্য, মুখের অনুক্ত কথাবার্তা আমাকে বিচলিত করে। ভাষা দেবার জন্যে আমি অতীতের মধ্যে আজ সেইসব হারানো জিনিস খুঁজি; তাই নিয়ে আমি লিখি।

কাজাখ কবিকে আজ একজন গবেষণাকর্মীও হতে হবে। কেননা সবশেষের উটকে সবচেয়ে বেশি ভার বহন করতে হয়; যে যাত্রীদল এগিয়ে গেছে, তাদের ফেলে-যাওয়া সমস্ত সামগ্রী চেপে বসেছে তার পিঠে।

আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেককে তার নিজের যুগে এমন অসম্ভব সক্রিয়ভাবে এমন প্রচণ্ড গতিশীল হয়ে বাঁচতে হয়, যেন তার কাছে সেটাই হল অন্তিম যুগ। আমাদের নির্বিকার পূর্বপুরুষেরা সময়াভাবে অথবা ক্ষমতার অভাবে যেসব সত্য উপলব্ধি করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি, আমরা সচেতনভাবে তার দায় নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিই। কাজেই আমরা এমন সব জিনিস নিয়ে আমাদের সময় কাটাই যা একেবারেই অনাবশ্যক বলে মনে হতে পারে—আমরা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রূনের অর্থোদ্ধার করি, ইট্রারিয়ার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করি, সুমেরের পুরাতত্ত্বের গভীরে ডুব দিই, মহেঞ্জোদারোর দুর্বোধ্য লিপি পড়বার চেষ্টা করি। কে কত লাইন লিখল তার সংখ্যা দিয়ে কোনো কবির কাজ যাচাই করা যায় না—বরং তার কাজ তাকে কতটা তৃপ্তি দিয়েছে তাই দিয়ে তার কাজের বিচার হবে। যে কাজই তার করতে ইচ্ছে হবে, সেই কাজেই তার উচিত নিজেকে লাগানো।

কারণ, সংস্কৃতি হল সেই সমস্ত কিছু যা আগ্রহ জাগায়। আর পরিণামে কী হল সেটাই আমরা দেখব। যেমন কাব্য, তেমনি অন্য যে কোনো শিল্পরূপ সম্পর্কে এ কথা সত্য। একটি বিষয়, একটি বুনট, একটি ভাব—কোনো কিছুর মধ্যেই কবিকে ঠেসে দেওয়া যায় না। ছোট ছোট সহস্র বিষয়, সহস্র বুনট, সহস্র ভাবের ভেতর দিয়ে কবি তার নিজের রাস্তা ক'রে নেবে।

দশ বছরেরও বেশি আমি ইতিহাস আর ভাষাতত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করছি। ইগোর সম্পর্কিত প্রাচীন রুশ মহাকাব্য আর প্রাচীন তুর্কী অক্ষরের উৎস—এই নিয়ে আমার অনেক রচনা আছে। স্লাভ ভাষাসমূহে ব্যবহৃত তুর্কী শব্দের ব্যুৎপত্তি সংবলিত একটি অভিধানের জন্যে এখন আমি মালমশলা সংগ্রহ করছি।

যুক্তরাষ্ট্র আর পারী থেকে ঘুরে এসে 'রাতের নিবাস পারী' বইটি

লিখি। তারপর ক্রমে ক্রমে বার হয় 'সূর্যোদয়ের শুভক্ষণ', 'বাঁচুরে বছর', 'মাটির কেতাব' ইত্যাদি।

মাঝে ফিল্ম নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলাম। কাজাখ ফিল্ম স্টুডিওতে মুখ্য সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছি এবং বেশ কয়েকটা ছবিও তৈরি করেছি—কিছু কাহিনীচিত্র আর কিছু আবেগময় তথ্যচিত্র।

এখন আমি কাজাখস্থান লেখক সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির সম্পাদক এবং আফ্রো-এশীয়দের সঙ্গে সংযোগকারী কাজাখ সংস্থার সভাপতি। বেশ কিছু সাহিত্যিক পুরস্কার পেয়েছি—তার মধ্যে কাজাখস্থান কমসোমল, সোভিয়েত দেশের কমসোমল আর কাজাখ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার॥

মারিয়াম সালগানিক-কে

মা

যদি মানুষ হোস, দুনিয়ায় নাম রেখে যাস
আর হয়ত সেই নামে
লোকে তোর স্বজাতিকে চিনবে ·
কালের খরস্রোতে চিরদিন মাথা নোয়ানো
বেতসের মতন
চিরকনিষ্ঠ·চিরদুঃখী সে।
সফর মানেই দূরদেশে পাড়ি দেওয়া,
খাটুনি মানেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা,
তোর ব্যাকুল মুখে আমি গুঁজে দিচ্ছি
আমার ভরে-ওঠা স্তন,
তোর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি আমার দুধ—
তুই বড় হ।
দুনিয়ায় তুই নিজের নাম রাখ্।
কেমন করে, সে আমি জানি না,
আমি বলে দেব না কোনো উপায়।
তোর জন্যে
কোনো ঘুমপাড়ানী গান আমি গাইব না।
লড়াইতে
তোর·লাগবে আমার শক্তি,
মৃত্যু যখন উ[illegible]র মত দাঁত বার ক'রে
তোর চোখে থুথু ছিটোবে
যখন এক ফোঁটা অশ্রুর মত
ঘাসের ওপর ঢলে পড়বে তোর বন্ধু,
যখ[illegible] মস্ত রাস্তা তোকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে,
তখন [illegible]ার বলতে ইচ্ছে হবে :
'বাছা আ[illegible], মাথা উঁচু করো,
এখন তুমি কত বড়।

গুলির সামনে দাঁড়াও—
লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুক।'
লোকে তখন আঙুল দিয়ে
একবার তোকে একবার আমাকে দেখিয়ে
কত অনায়াসে বলতে পারবে :
'এই সাদাসিধে ছোকরাটি দেখছ—
ও সত্যিকার একজন মানুষ,
এই সাদাসিধে মহিলাটি দেখছ—
উনি ওর মা।'
সব রাস্তাই বন্ধ—কোথায় পরিত্রাণ ?
বিপদের দিনে বাঁচার উপায় হল
তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় হওয়া।
কিন্তু যখন উপত্যকার ওপর দিয়ে
সাঁই সাঁই করছে না বুলেট,
সময় যখন হামাগুড়ি দিয়ে চলছে
আর বয়স যখন তীরবেগে ছুটছে না,
লোকে যখন নাচছে গাইছে, যখন কাঁদছে না,
হাসিতে যখন অশ্রু থাকছে না,
কুমারীর দল যখন র'য়ে ব'সে
চুল বাঁধতে পারছে,
যখন ভয়কাতুরে ছোকরার দল
মুখে খুব রাজাউজীর মারছে,
তখন, বাছা আমার, তুই মুখ লুকিয়ে
চোখের আড়ালে চলে যাস ॥

কুরগালজিনো হ্রদে

অগস্টের তুমুল হৈ চৈ
কুরগালজিনো হ্রদে—
আফ্রিকার সূর্য কী এক রহস্যে
জ্বলে উঠেছে
পাখিদের মনে।
ওরা যাবে, কিছুতেই ধ'রে রাখা যাবে না,
আপন নীড়গুলোর মাথায় চক্কর দিয়ে
রাজহংসেরা ঝাঁকের পর ঝাঁক বেঁধে
দূর দূর দেশে উড়ে যাবে।
ও সাদা হাঁস,
ওরে ও অভাগা হাঁস,
আমরা তোমাদের যেতে দেব না,
তোমাদের গতিরোধ করবে
প্রিয় প্রান্তর আর ঝোপঝাড়,
বিষণ্ণতার ফাঁদ-পাতা লুতাতন্তু।
তোমাদের জন্মভূমি তোমাদের ধরে রাখবে,
ছোট ছোট কয়েকটা ছর্‌রায়
তোমাদের ফিরিয়ে আনবে।
শরতের ভারে
বাগানের ডালগুলো ভেঙে পড়ছে।
গুলিবিদ্ধ একটি হাঁস
একটা ডোবার মধ্যে ছটফট করছে।
এমন কোনো চাঞ্চল্যকর খবর নয়—
ফ্লেমিঙ্গো নয়, পেলিকান নয়,
লোকসান সামান্য
—তিন কিলো ওজনের
এক মামুলী রাজহাঁস।
"গুলি ক'রে মারা হয়েছে—তো হয়েছে কী ?

এ নিয়ে তোমার কবিতা লেখার
কী হল ?
একটি তো ভারি রাজহাঁস, একশো নয় দুশো নয়
আর দেখ, কবিতাও কিছু থানার ডায়রি নয়।
তুমি সুন্দর ক'রে ওর জঙ্গুলগুলোর কথা
ছোট ছোট ছর্‌রা-বেঁধা
দাগগুলোর কথা বলতে পারো,
বলতে পারো এই হ্রদ—তার এই জন্মভূমির কথা'॥
যে খুন করে,
ধিক্ সেই জন্মভূমিকে।
এখন শরৎকাল।
ঝ'রে পড়ছে প্রথম তুষার
—ওর ধবধবে, ভয়ঙ্কর পালক।

ও আমাদের এনে দিত বসন্ত,
চলো ওকে পায়ে ধ'রে বলি
যেতে। কিন্তু সব নিষ্ফল।
শরৎ ওকে ধ'রে রাখবে ॥

রাতের বিমানে

আমি মিলিয়ে যাচ্ছি আকাশে,
পাখার নিচে রাতের অন্ধকারে কত
আগুনের মধ্যে প'ড়ে জল হয়ে
মাটির গায়ে আলোগুলো গলে যাচ্ছে

রাত্রে পারীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি—
আগুন, সেই একই গেরুয়া রঙের আগুন।

জানলায় মুখ লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছি
সমস্তই আমার কত চেনা।
ঘোড়ার ঘুঁটে-জ্বালানো স্তেপের আগুনের মত
বিদেশী বন্দরে বহ্নিমান সব শহর।
পৃথিবীকে আবৃত করা এই রাত্রি দেখছি খুব খারাপ নয়।
আলোগুলো পিট পিট করছে,
রাডারগুলো যেন ক্ষেপে উঠেছে,
এরা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে
রাস্তা পরিষ্কার।
রাতের চোখে সুর্মার রং।
নিচের ঘাস অন্ধকারে ভাসছে।
জ্বলন্ত আগুন। আর চাঁদ। আর ঘোড়ার দল টান টান হয়ে আছে
কখন উঠবে গগনভেদী চিৎকার—আলি! আলি! আলি!

আমি সব কিছুর ওপর দিয়ে চলেছি।
যেন ব'সে আছি এক তারাঘরে।
আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে, তাদের আর কিছুই লুকোবার নেই।
মেয়েরা তাদের পা ঢেকে
বাতির আলোয় আমার গল্প পড়ছে।
জীবনের সব কিছুই যেন গুরুত্ব না পায়।
আলোগুলো। সারা রাস্তাই আলোগুলো চুপচাপ থাকছে।
প্লেনের জানলা কুয়াশায় ভেজা।
আলোর ঝাড়গুলো একে একে
ভেসে উঠে তারপর সব একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে॥

পাঞ্জা

আফ্রিকার আর এশিয়ার সমস্ত গোরস্থানেই তুমি দেখবে
কবরে কবরে মানুষের হাতের পাঁচ আঙুলের ছাপ।

তোমরা, যারা বেঁচে আছো,
অবমানিতদের দয়ার্দ্র হৃদয়ের কথা
প্রমাণ ক'রে দেখাও।
ধূলিকীর্ণ সমাধিস্থলে খাড়া করা
যেমন তেমন ক'রে কাটা রুক্ষ পাথর।

পাঁচটি ছড়ানো আঙুলের অবয়বে
সেই কোন্ কবেকার এক ইশারা—
তোমরা ভুলে গেছ, তোমাদের মনে করতে হবে।
শিশুদের হাতের আঙুল আমি দেখতে পাই
পাথরের গায়ে
ক্রুশবিদ্ধ।
তোমরা, যারা বেঁচে আছ,
ভুলে যেও না
যারা আজ নেই—
পাগানিনির বিদ্যুতের কশা,
উড়োজাহাজের পাঁচটা আঙুল।
আমি আমার গলায়
কবচের মত
ঝোলাব
নিঃশব্দে ডুবে যাওয়া রমণীদের
আঁকড়ে-ধরা আঙুল।
যারা মিথ্যে, নাটুকে বক্তৃতা দিতে চায় তারা ধিক।
আমি কাটিয়ে দেব আমার জীবন—

সব সময়, ছোট্ট সংক্ষিপ্ত—
হাতের আঙুলগুলো মুঠো ক'রে।
আমার মৃত্যুর পর
আমার বুড়ি মা পাথরের ওপর খোদাই ক'রে দেবে
একটা খোলা মুঠো
আমার ডান হাতের॥

বৃষ্টি—এরোপ্লেন থেকে

হয়ত সমুদ্রের ওপর এখন বৃষ্টি,
কিন্তু নিচে শুধুই দুর্ভাগা হল্‌দে মাটি
কাশ্যপের এক আধভর্তি তিক্ত কলস
বসুমতীর তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে
জং-ধরা ঊষর মেঘ,
যেন অপার্থিব তৃষ্ণার বিস্ফোট,
ছোরাবিদ্ধ সূর্যাস্তের ঢেউ,
মজা ক'রে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, আমাকে অনুসরণ করছে
কানা বৃষ্টি হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে
মৃত্তিকার সমুদ্রের সামনে—
অপরাধী, দুর্বল আর বুড়ো বর
তরুণী অনাদৃত পৃথিবীর॥

এক অন্ধ দর্শক

একবার এক অন্ধকে আমি দেখেছিলাম
লুভ্‌র-এর চিত্রশালায়।
একা, কেউ তার সঙ্গে নেই,
   নিঃশব্দে
সে তার চক্ষুহীন কোটরে একদৃষ্টে চেয়েছিল
ভেনাসের ছবির দিকে।
নিগ্রোরা এমনি ক'রে
          অন্ধকারের দিকে তাকায়।
ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। হলের ঝকঝকে মেঝেতে জুতোর মশমশানি।
অন্ধ লোকটি একটি বিরাট বাঁধানো
          ফ্রেমের সামনে দাঁড়াল।
যে ক'রেই হোক, সে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল।
          চোখের খোদলের ভেতর দিয়ে?
নাকি তার মুখমণ্ডল দিয়ে?
অনেকখানিই অনুমান—
সে দেখছিল তার চোখ দিয়ে।
এক ছবি থেকে অন্য ছবি, এমনি ক'রে দেখতে দেখতে সে হেঁটে যাচ্ছিল
যেন কোনো বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে,
ক্রমশ আস্তে,
আরো আস্তে···

তারপর থেমে গেল।
এবার সে মুগ্ধচোখে দাঁড়িয়ে প'ড়ে
          আর যেন কিছুতেই নড়তে চাইছে না-

তার সামনে ফাঁকা দেয়ালে
এখন শুধু একটা ছবির শূন্য নীড়।

বলো দেখি…

বলো দেখি…
আকাশে মানুষ কেন হাত বাড়ায় ?
বাজপাখিরা মাথা চুলকে ভাবে,
পাখিদের বাহবা দেবার জন্যে নয়ত ?
মানুষ তার সৃষ্টি-করা
সৌন্দর্যকে
কেন বলে 'মহান', 'মহিমান্বিত' ?
নদী যায় গড়িয়ে গড়িয়ে
আর সমতলকে স্তন্যপান করায়,
নদীর উপত্যকায়
শহরগুলো মাথা তোলে।
নদীর নীল নীল ধমনীতে মোড়া
এক বিশাল হৃদ্‌যন্ত্র
এই পৃথিবী উড়ে চলে।
গতকালের কুহেলিতে ঢাকা নক্ষত্রের দিকে এঁকে বেঁকে যাবে
এমন পথ তৈরি করা শক্ত
কিন্তু তার চেয়েও কঠিন
এই ভূমণ্ডলে এমন কোনো রাস্তা বার করা
যা চিরকাল ধ'রে ঘটাবে শহরের সঙ্গে শহরের মেলবন্ধন,
নদীর মতন পেরিয়ে যাবে দেশ,
সূর্যের রশ্মির মতন এফোঁড়-ওফোঁড় করবে অন্ধকার,
বিগত বছরগুলোকে পাইয়ে দেবে মুঠোর মধ্যে।
হৃদয়ের রাস্তা
তোমাকে পৌছে দিয়েছিল নক্ষত্রে।
কঠিন খুব,
তবু তোমাকে পেতেই হবে সেই রাস্তা,
কেননা মাটির এই রাস্তা
আজকের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর কাছে তোমাকে পৌছে দেবে…

প্রচণ্ড গরমে

আপেল গাছ। ধুলো জমেছে পাতায়।
তলায় তার দেখ, দুধারে ছড়িয়ে দুই বাহু
কী অপরূপ রমণী এক অঘোরে ঘুম যায়
কাছেই নদী। শোনা যাচ্ছে জলের কুলু কুলু!
লুটানো ফুলে গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে মৌমাছি।
বুকের ওপর দোল খাচ্ছে রোদ।

চলেছিলাম ঘোড়ায় চড়ে নদীর ধার দিয়ে।
কী অপরূপ রমণী এক! মাটিতে লোটে বেণী।
লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে তাকায় বুড়ো ঘোড়া।
আঙুল দিয়ে দেখায় রোদ
ছড়ানো তার দুপাশে দুই বাহু॥

তিন সেলাম

হে অতীতের কবিসকল,
আমার মনে পড়ছে না তোমাদের,
কিন্তু এক প্রাচীন তরবারির গায়ে
কিংবা কালের কলঙ্ক-পড়া এক সুরাইয়ের
নিপুণ গ্রীবায়
এক ব্রহ্মস্বাদসহোদর মিল এনে দেবার জন্যে
শহর আর গ্রাম আমি তোলপাড় করব।
আমি পাঠোদ্ধার করব অপরিচিত লিপির।
জলজল করো, দোহাই,
হে চাঁদ,

আর মাথার ওপর আলোকিত করো কাব্য—
নিকষ কালো পটে,
ছায়াপথের ছত্রে ছত্রে এক আগ্নেয় ভস্ম।
মানবজাতির উষাকাল না গোধূলি ?
আমার বয়ঃক্রম দিন আর প্রহরে
দীর্ণবিদীর্ণ।
কিন্তু একটি মুহূর্ত হতে পারে
একটি শতাব্দীর সমতুল্য,
যখন তুলাদণ্ড সুদূর অন্তরীক্ষে আরোহণ করে।
তোমরা তাদের দেখেছ বহুভাবে চিহ্নিত করতে :
একটি ঘণ্টা,
কিংবা তার জায়গায়, হয়ত, একটি স্তম্ভ।
যেমন দুঃখের,
তেমনি আনন্দোৎসবের
এটি একটি অভিজ্ঞান।
আবারও তোমরা দেখবে
মাথার ওপর উঠতে।
পৃথিবী,
আমি তোমাদের দেখেছি অমন সৌন্দর্যে নিজেদের আবৃত করতে
পৃথিবী, যার ভার কত আমি কিছুই জানি না,
কোনো দেশবাসীকে আমি কখনও ক্ষুণ্ণ করি নি,
আমি সুখী,
যতদিন এখানে আমার প্রয়োজন থাকবে॥

আমি জেগে আছি

দাদা, তুমি শান্তিতে ঘুমোও। আব্বাজান, ঘুমোও।
আমি জেগে আছি।
ছেলেমেয়েরা সগর্বে
আমার কথাগুলো হাঁ ক'রে গেলে।
আকাশে ভেসে থাকা
কি'বা পাথরের গা বেয়ে
ঝর্ণার মত আছড়ে পড়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।
আমি দেখেছি সুখের মুখ—সব কিছুই আমার প্রিয়।
তোমরা কি চেয়েছিলে আমি সুখের মুখ দেখি ?
রাত্রে আমি ভয়ের ভেতর দিয়ে হাঁটি,
আমি হাঁটি পাকদণ্ডীর রাস্তায়,
আমার হাতদুটো গোঁজা থাকে অন্ধকারে।
আমার মাথা ঠিক্‌রে থাকে কুঁজের মত।
কিছু একটা আমাকে বিচলিত করে—
অবশ্যই আমি জানি এই তৃণভূমির শেষ নেই।
তবু কী একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা!
হায়, এই পাহাড়গুলোর
অজানা আশঙ্কার ব্যাপারটা নিয়ে কী জ্বালাতেই না আমি পড়েছি

মণ্ডলাকার নক্ষত্র

স্তেপভূমির নিটোল সমতলের নিচে
তেরছাভাবে কেটে বার করা হয় স্তূপাকার খনিজ।
ধনুকের ওপর
উঁচিয়ে থাকা মাথার মতন,
বিচিত্র রকমের দৃষ্টিকোণে ভাঙা
কবিতার মতন—
স্তেপভূমির নির্লিপ্ততার ওপর দিয়ে

উত্তোলিত হয় অশান্ত খনিজ।
সবচেয়ে যা মূল্যবান, তার কথায়
কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এমনি ক'রে।
দূরের জিনিসগুলো আমাদের ভাওচি দিয়ে নিয়ে যায়।
কাছের জিনিসগুলো
মণ্ডলাকার।
কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের নীল নক্ষত্রগুলো
কোণাকুণি।
নক্ষত্র থেকে আমাদের রক্ষা করে
ছাদ,
আমরা কিন্তু তার আস্তর ফুঁড়ে
বেরিয়ে যাই
অনুপ্রাণিত পাহাড়গুলোর মাথায়
বিবর্ণ হয়ে গেছে
চাঁদের বিষণ্ণ বলয়।
মেঘের খাড়াইগুলোতে
চিহ্নিত হয়
বিদ্যুতের উত্থান আর পতন।
আর রামধনুও, জেনো, ধনুক নয়—
সম্ভবপর যেকোনো কোণের চেয়ে
তা ঢের বেশি তীক্ষ্ণ।
বলা হয় আমরা নাকি আজ যা ধরি কাল তা ছাড়ি—
কিন্তু ভালবাসাকে আমরা একবার যে ধরেছি
কিছুতেই আর ছাড়া নয়।
আমরা উড়ে যাই যেখানে যাবার। আমরা ঠিক পৌঁছে যাই।
আর আমাদের সঙ্গে দেখা হয়—
এক উপত্যকার। এক প্রান্তরের। এক কর্ষিত ভূমির।
সারবন্দী পাহাড়ের অসমান উচ্চতার, সিন্ধুশকুনের আঁকাবাঁকা পথরেখার।
একটি সহজসরল মণ্ডলাকার নক্ষত্রের॥

রোগা ঈগল

মোটাসোটা ঈগলগুলো বুকে ভর দিয়ে হাঁটছে মাঠে,
রোগাপটকা ঈগলগুলো মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।
ঈগলের ধারণায়, সবাই হচ্ছে ঈগল,
সকলের স্বভাবচরিত্রই একরকমের ব'লে তার সন্দেহ।
পাহাড়ী জাতের ইঁদুর দেখে সে ছোঁ মারে,
ভাবে বুঝি সেটাও একটা ঈগল।
তারপর গপাগপ খেয়ে ফেলে মনে মনে বলে—
হাঁ গো, কিঞ্চিৎ তেতো না!
মনিষ্যিরা অবিশ্যি বলতে ছাড়ে না যে, ঈগলে পেড়ে ফেলতে পারে
একটা ভেড়ার ছানা,
একটা ভেড়া,
একটা ছাগল।
ঈগল কখনও জন্মেও নিজের ছায়া দেখতে পায় নি,
তার শিকার দেখতে পায় তার অগ্নিময় ছায়া।
ঈগলের যে কায়া সেই তার ছায়া,
আর সে নিজেই হল ছায়ার অপচ্ছায়া।
ভারী ঈগলেরা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে।
আর মাটির ওপর
ঘন সবুজ আর কাঁচা সোনার রঙে
ঘাসগুলোকে অবিচলিত রেখে,
ঘাসগুলোকে অক্ষত রেখে
রোগাপটকা ঈগলেরা তোমাদের পাহাড়তলীর
গোল সমতলের ওপর দিয়ে
কোণ বরাবর উড়ে যাচ্ছে।
ঈগলেরা তো যাবেই।
হলুদে আর সবুজ তো থাকবেই।
তৃণময় নিষ্পাদপ ধু ধু করা প্রান্তর হল সেই পাহাড়
যেখানে শিখর নেই, ফাটল নেই

বুখারার রোমাঞ্চ নেই
বজ্র নেই, বিদ্যুৎ নেই
গতি নেই, স্তব্ধতা নেই।
স্বর্গের নিশ্চুপ বিভীষিকা
আর ঈগল ॥

সুম্বুলের তারা

যখন সুম্বুলের তারা
ঝিকমিক করতে করতে ফুটে উঠবে,
আর ঘোটকীর পাল
বিলিয়ে দেবে তাদের সাদা দুধ,
আমার তৃণভূমির ওপর দিয়ে সরু সরু গলাগুলো বাড়িয়ে দিয়ে
যখন কলহংসেরা উড়ে যাবে
আর অন্ধকারে, ইস্ কী বিষণ্ণ সুরে যে ডেকে উঠবে
বেচারা, আহা বেচারা কলহংসের দল।
তার মানে, ময়দানে ঘাসের বয়স
বেশ অনেকদিন হল।
কিপ্‌চাক, ওহে কিপ্‌চাক, এবার গা তোলো…
সুম্বুলের ঝিকমিকে তারা,
আমি চাই, আমার হাতের ওপর মরুক ॥

আহাম্মকের কথা

মায়ের দুধের সঙ্গে তোমার মধ্যে
যদি এই দুর্বুদ্ধি ঢুকে গিয়ে থাকে,
তাহলে দুনিয়ার তামাম গরুর পক্ষেও
তোমার কল্‌জে বড় করা সহজ হবে না।

যদি এই পৃথিবী পর হত,
যদি আমার স্ত্রী হত দৃষ্টিহীন
তাহলে আমি আমার ব্রত লঙ্ঘন ক'রে
ঠায় তোমার দিকে আমার চোখ রাখতে পারতাম।
শুধু ভয়কে আজ আমি ডরাই
আমার করুণা এখন ওষুধের চেয়েও তেতো—
বুড়ো ব'লে আমি যাই বুড়িদের কাছে
তুমি ভেঙে গেলে আমি তার একটা টুকরো।
বাঘেদের মধ্যে আমি বাঘ,
বানরদের আস্তানায় আমি বানর,
নৈঃশব্দ্যের তীরভূমি হয়ে আমি নৈঃশব্দ্যে ভাসি,
জ্যোৎস্নার মধ্যে আমি চাঁদের হাসি।

হে আক্কেলমস্ত, কান দুটো আরেকটু লম্বা করো
গুপ্তধন থাকার চেয়ে দিলদরাজ হওয়া ভালো।
এই ঠিক।
হে আক্কেলমস্ত, একজন আহাম্মকের কথাও শুনো
যদি সেই আহাম্মক তোমাকে সত্যি কথা বলে॥

আঙুরক্ষেতে

আঙুরক্ষেতের ওপর দিয়ে
যে যার ডেরাগুলোকে
ঘাড়ে নিয়ে
শামুকেরা হামা দেয়।
এক যাযাবর টগবগিয়ে যেত
কিন্তু তার বয়স হামা দিত।
প্রত্যেক জটিলতারই
একটা নির্বিকার ছবি আছে
এবং সেটাতে থাকে সরলতার প্রকাশ।
কোনো সামাজিক ঘটনার অর্থ বুঝতে হলে
প্রকৃতিতে তার প্রতিরূপ খোঁজো!
কোনো শামুককে যদি তুমি বলো : হামা দিচ্ছ হে
সে বেজায় অবাক হবে :
বা রে, আমি যাচ্ছি টগবগিয়ে॥

আমাদের গ্রামে ছিল এক চর্মকার

এই চর্মকার সবার জুতোই
কেবল নিজের মাপে বানাত,
সে ভাবত এইভাবে সে চারিয়ে দিচ্ছে সাম্যের ভাব
লোকটা ছিল বেঁটে খয়াখর্বুটে
আর আমরা একেকজন দৈত্যের মতো ঢ্যাঙা,
ফলে জুতো পরা তো নয়
আমাদের পক্ষে সে এক নরকযন্ত্রণা।

কিন্তু সবাই ধরে নিয়েছিল ঐ জুতো
ঈশ্বরের উদ্ভাবিত,
যাতে মুসলমানেরা
হরবখত
নামাজ পড়তে পারে
(তোমাকে জুতো খুলে রেখে
বসতে হবে নামাজে, বুঝলে ?)
অতএব, প্রার্থনা হল
যন্ত্রণাক্লিষ্ট চরণের গান।

আবালবৃদ্ধ
সবাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে
ছুটে চলেছে মসজিদে,
আর সেইসঙ্গে চেল্লাচ্ছে
(পাগুলো টাটিয়ে উঠেছে ব্যথায়) :
'আল্লাহু আকবর !'

তোমার জুতো তোমাকে আদেশ করছে
তুমি রসুলের বন্দনা গাও
পায়ে যাদের জুতো নেই
যারা অলপ্পেয়ে অলবড্যে,
শুধু তাদেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই।
আর বিশ্বাস নেই আমাদের ঐ চর্মকারের,
তার পায়ে ফোস্কা পড়ে না।

আল্লাহু আকবর। কিন্তু তিনি তো থাকেন সেই কোন্ সুদূরে। আর ঐ চর্মকার বেটা দন্তবিকশিত করে রয়েছে খোদ্ এইখানে। এখন গাঁসুদ্ধ লোক কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে—চর্মকারের পা, হেই গো, একটুকুন বড় হোক। ওস্তাগররা, হেই গো, একটুকুন কম ধুমসো হোক। টুপিওয়ালারা একটু কম মাথামোটা হোক। ইত্যাদি ইত্যাদি

হে মরুভূমি

পামীরের মাথার ওপর পা ঘষছে প্লাবন—
এক জলগর্ভ ধুম্‌সো মেঘ
হেঁটমুখে
নিজেকে উজাড় ক'রে
জুড়িয়ে দেয়
দগ্ধানো বুকফাটা পাষাণের শোকতাপ।

পাহাড়ে পাহাড়ে হেঁটে বেড়ায় মেঘ
আর বৃষ্টির আদরে মাথা-খাওয়া চূড়াগুলো—
যারা উদ্ধত, তারা ধসে গিয়ে হয় বালির টিপি।
ভেজা চটচটে পশমের গন্ধ কুয়াশাগুলোর গায়ে।
অনতিদূর অতীতের গল্পগুলো
বললে বিশ্বাস করতেই চাইবে না মরুভূমির বালিয়াড়ি।
প্রাচীন তিমুতারাকানের উঁচু মিনারগুলো
হিসারের সমাধিতে মুদ্রিত হয়ে টিকে আছে।

বিনষ্ট শিখরগুলো থেকে ভেসে যায় মেঘ।
পরিত্যক্ত বালির ওপর
এসে দাঁড়িয়ে যায় একটি মেঘ,
শুক্‌নো বুকে দুধের শেষ ফোঁটাটুকু নিয়ে
জননীর মত।
বালিয়াড়ি স্তব্ধ। হে চূর্ণ পাথর,
আমি যা পারি তোমাকে দিচ্ছি,
তুমি নাও এই স্নিগ্ধতা…
যদি কোনো অভিশাপের মতো নিষ্ফলা হয় আমার ছায়া, তাতেই বা কী।
হে মরুভূমি, তবু আমার এই ছায়াকে কাছে রাখো।
আমি কুয়াশার এক ধূসর আস্তরণ,
আকাশের ঝকমকে জঘন্য নীল নিয়ে তোমার কাজ নেই।

যখন আমি থাকব না, হে মরুভূমি, তখন তুমি ব'লো :
যেখানে সে মেঘ হয়ে যায় না, জেনো, সেখানেই মরুভূমি

ইষ্টনাম জপি

(আউশ্‌ভিৎস্‌ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী
পোলিশ লেখিকা ভি, ঝিভুলস্কায়া-কে)

এক ডোরা-কাটা পার্কে এক ডোরা-কাটা বেঞ্চিতে
আমি ব'সে।
শরতের ঝকঝকে সূর্যকে আমি বিদায় দিচ্ছি।
আমার কোলের ওপর বইয়ে খোলা পাতাগুলো ফরফর করছে।
আরামে গা এলিয়ে দিয়ে ব'সে আছি।
লোকে বাড়ি ব'য়ে নিয়ে চলেছে গোলাপ : বেগ্‌নে, হলদে, কালো।
কেউ বন্ধুদের, কেউ দেবে গোলাপ তার ভালবাসার মানুষকে,
আজ দিতে হয়
গোলাপ, হাড়-বার-করা মেয়েদের পিঠের ক্ষতের মত।
একটা কচি মেয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে।
সেই কচি মেয়ের পরনে ইস্কুলের পোশাক।
তার ঠোঁটময় ক্রীম,
কোনো মৃগীরোগীর গ্যাজলা-ওঠা মুখের মত।
চটচটে…
বিয়াল্লিশে একটি ছেলে চেয়েছিল খাসার মাংস—
খাদ্যের তালিকায় এটা যোগ করুন, ভাই।
তেতাল্লিশে তার বেজায় ইচ্ছে করেছিল রাই থেকে করা রুটি খেতে—
দেখবেন ভাই, ভুলে যেন এটা তালিকা থেকে বাদ প'ড়ে না যায়।
চুয়াল্লিশে সে হাম্‌লে বেড়াত একটুখানি বীটের কন্দ খাওয়ার জন্যে

আর পঁয়তাল্লিশে,

যখন এমন কি বুড়োরাও সব ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল,

সে এসে দাঁড়াত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, তার আত্মীয়কুটুম্বদের প্রতীক্ষায়,

সৈন্যদের পুরো একটা দলের জন্যে···

কেমন যেন জংলী হয়ে গেল, ছটফট ক'রে বেড়াত,

যে পর্যন্ত না চেঁচাতে চেঁচাতে হেঁচকি উঠে যেত,

তার চেঁচানো বন্ধ হত না।

ছোট্ট এইটুকু ছেলে— কতটুকুই বা সে বুঝত।

সে তখন জানত না

তার কাছছাড়া ক'রে নিয়ে গিয়েছিল শুধু পুরুষদেরই নয়।

তার কোলের ওপর শীর্ণকায় বই,

যেন বহুবিলম্বে পৌঁছুনো কোন্ কবেকার একটা চিঠি···

সৈন্যদের ওরা হেনস্থা করে করুক

কিন্তু মেয়েদের ধ'রে যেন না টানে।

চমৎকার চমৎকার সব কথা কাদের উদ্দেশে বলা হবে?

এই এদের? টাইফয়েডে মুড়িয়ে নিয়েছে যাদের চুল?

যাদের ঠোঁটগুলো লিপস্টিকের মত পিত্তরসে মাখানো?

এই এদের? যারা বঞ্চিত হয়েছে

মাংস, রুটি, বীটের কন্দ

আর মা-র কাছে চিঠি লেখা থেকে?

চোখের জল, মনের বিষাদ, জীবনের মাধুর্য কেড়ে নিয়ে

যাদের জন্যে শুধু খুলে দেওয়া হয়েছে নরক,

শুধু পলায়ন, আত্মহত্যা

আর গ্যাস-কুঠুরি?!

অনুকম্পা পেল না এই মেয়েরা।

ক্ষয় হয়ে যাওয়া কটুগন্ধ

দেহগুলোর জন্যে দরদ।

রাতের দুঃস্বপ্ন হতে পারত—

কবির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া রমণী!···

এখন বিনা লজ্জায় আমি সব খুলে ফেলতে পারি

বেপরোয়া হয়ে আমার যা খুশি এখন আমি সাজতে পারি
আমার ইচ্ছে করছে ছেলেমানুষ হয়ে যেতে
যাতে আমি হাসতে পারি,
কিংবা ইস্কুলের পোশাক-পরা ঐ যে ওর মত
ঠাণ্ডা হিম মিষ্টি ক্রীমে
দাঁত বসাতে,
একে ওকে মুখ ভেংচাতে—

কিন্তু তার কারণ বুক-হিম-করা অনুষঙ্গগুলো নয়।
রাস্তাটাতে এখন কত ফোয়ারা, মাঝখানে মাঝখানে লালের ছোপ,
জমকালো লাল ক্যানা ফুল, পুলিশের উর্দিতে লাল স্ট্র্যাপ।
হৃদয়বান আর প্রাজ্ঞ
নতুন এশিয়ার মহানগরীর প্রত্যূষ।
মনে মনে ইষ্টনাম জপছি।
উজ্জ্বল সব মুখমণ্ডল
সন পঁয়তাল্লিশ। যুদ্ধবিজয়ের দিন॥

মাটির কেতাবের দুটি খণ্ডাংশ

১। দৈববাণী

…পৃথিবী হল বৃত্ত
তার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি হয়ে এক সূক্ষ্ম ঢ্যারাচিহ্ন
(এক সবুজ পাতার আবডালে
তুমি হলে পরিণততম আপেল)
বৃত্তের চারটি চাপ
চারদিক থেকে কেন্দ্রের অভিমুখে তাকিয়ে,

তুমি কেন্দ্রের দিকে স'রে যাও
আর তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠো।'
(ভরে উঠলে তুমিই সর্বাগ্রে
অন্যেরা এখনও তৈরি হয়,
যারা তোমার সবুজ স্বজাতি
রোদে পিঠ দিয়ে তারা ঘুমোচ্ছে,
এসো আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি
স্বপ্ন ওদের মধুর হোক,
এসো আমরা মন দিয়ে শুনি
খান্ ইশ্‌পাকার বচন)।
—একটি ক'রে চেতন জীব
আর তার মাথায় আকাশে বেড়ে উঠছে একটি ক'রে তারা,
তারাগুলো খসে পড়ছে…
—আপনি বলছেন তাই ?
—হ্যাঁ।
মানুষ এক অন্তহীন ঘুমে ন্যাতা হয়ে থাকে,
কিন্তু প্রত্যেক শতাব্দীতে
ভোঁস-ভোঁস ক'রে ঘুমুনো জনসমুদ্র থেকে উঠে আসে
একজন।
হাজারে কিংবা শ'য়ে একজন
—তার আচম্‌কা ঘুম ভাঙে,
পোড়ার ব্যথায় সে চেঁচাতে থাকে :
আকাশ থেকে তার নক্ষত্র তার ওপর খসে পড়েছিল।
ঘুমন্ত লোকগুলোর মধ্যে
গ্রহটাকে নিয়ে সে হৈ-হল্লা বাধিয়ে দেয়,
অসাড় দেহগুলোকে সে পা দিয়ে ঠেলা দিতে থাকে—
নাঃ, কেউ না।
লোকটা চেঁচায়, রাগে ফোঁসে—
কিন্তু না,

কেউ জাগে না।

(কিন্তু পৃথিবীকে সে এমনভাবে দেখতে পাবে,
তার আয়ুষ্কালের পর
যে রূপটি আর কখনই কেউ দেখবে না)।
তারপর সুপ্ত মানুষেরা
অনাগত কালে আবার পাড়ি দে-ব,
আর পরের শতাব্দীতে
বর্তমানকে
ধ'রে রাখতে কিংবা উদ্ঘাটন করতে
আবার একজন জেগে উঠবে।
একটি ক'রে যুগ অতিক্রান্ত হবে
আর আকাশে সৃষ্টি হবে একটি ক'রে তারার শূন্যতা
কপালে নক্ষত্র নিয়ে সেই লোকটি
চোখ সম্পূর্ণ খোলা রেখে বাঁচছে।
আহা বেচারা, এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালে
কী প্রতীয়মান হচ্ছে তার কাছে ?
'জীবনটা স্বপ্ন'—অন্যেরা বলেছেন আমাদের আগে।
জাগরণ হল মৃত্যু। মন্দ নয়, কী বলো ?
—ধার আছে।
আকাশে বেশ অনেক জুড়িয়ে-যাওয়া তারা
রয়ে গেল কিনা দেখে নাও।
এই সর্বশক্তিমান ঘুম—
এরই নাম
অনুজীবন।
…কাজেই আকাশ যখন শূন্য
তখনই তাদের আবির্ভাব হবে :
নিটপিটে সব মানুষ,
ঘুমজড়ানো চোখে
আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে

ফুটো দিয়ে চোখ কুঁচকে দিনের আলোর দিকে তাকাবে,
পাছা চুলকোতে চুলকোতে
তারপর একসঙ্গে
এক জোড়া খিস্তির গল্প
কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বলল—
কী গো ?
—অঃ ! জব্বর…
পৃথিবী ঈষৎ বদলেছে
ভূগোল তার যথাস্থানে ঠিক নেই :
অনেক দিন আগেই
ঘুমের মধ্যে সরতে সরতে
ওরা একদম কিনারার দিকে চলে গিয়েছিল।
লোকে গা এলিয়ে দিয়ে ভাববে
বাবা গো মা গো। এ যে দিনে ডাকাতি গো। কেন্দ্র গেল কোথায় ?
কিন্তু তারপর দ্বিতীয়বার ভেবে টেবে বলবে : নেই তো নেই।
এটা এখন শরৎ।
আহা।
গাছপালার বাড় বড় কম,
মন-মরা বরফে ঢেকে যাবে প্রান্তরের ঘাস,
আদিকাল থেকে ধবল তুষারে
প্রতিরক্ষাহীন হও,
ও আমার মানুষ,
তোমার অবসাদভরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে প্রত্যেক শতাব্দী।
ভ'রে উঠলে তুমিই সর্বাগ্রে, অন্যেরা এখনও তৈরি হয়,
যারা তোমার সবুজ স্বজাতি
রোদে পিঠ দিয়ে তারা ঘুমোচ্ছে,
এসো আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি
ওদের স্বপ্ন মধুর হোক,
এসো আমরা মন দিয়ে শুনি
খান্ ইশ্‌পাকার বচন॥

২। বর্গীর দল

চিত্রবিচিত্র ঘোড়ার ওপর আমরা সওয়ার,
পেটের ওপর ভর দেওয়া আমাদের হাত—
প্রার্থনারত।
জাতযাযাবর এই দলটার পুরোভাগে
উড্ডীন হয় পতাকার পর পতাকা।
একেবারে কেন্দ্রস্থলে খান্-এর শ্বেত পতাকায় লাঞ্ছিত
নেকড়ের মাথা আর ভয় দেখানো সূর্য,
ডাইনে আর বাঁয়ে পৎ পৎ করছে
রক্তবর্ণ নিশান।
টগবগে ঘোড়ার পদশব্দে শঙ্কিত
গ্রীক, রোমান আর গথ্‌দের
দৃষ্টিগোচর হয়েছিল
ভোরের সূর্যের মত লাল,
ঘোরতম লাল
আমাদের পতাকা
সূর্যাস্তের দেশগুলোতে পৌঁচেছিল
সূর্যাস্তের রং।
ওরা জেনেছিল, রূমের সূর্যাস্তের রং হল
পুবালী নিশানের।
রূমের রমণীদের ওপর অরুচি ধ'রে যাওয়ার পর
পাকা চুল আর পাকা দাড়ি নিয়ে আমরা সব ফিরে যাব,
লড়াই বলতে তখন শুধু হাতাহাতি,
পাহাড়ী নদী—
মাঠের খানাখন্দ।
আমরা ফিরে আসব ঘাসের প্রান্তরে,
ক্রমশ পাতলা হবে অশ্বারোহীর দল,
আমাদের সেনাপতিরা পিঠ খালি ক'রে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে।

চলো।…বলার সঙ্গে সঙ্গে রেকাবে পা ;
চলো।…বলতেই মাথায় চেপে বসল ফারের টুপি,
চলো।…আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ঘোড়সওয়ারের জাত—
চাষী গৃহস্থদের বিরুদ্ধে যাযাবর লুটেরার দল ॥

উড়াল

দেখ দেখ,
মেঘের দল
শহরের মাথার ওপর ত্রিশঙ্কু।
এখন পর্যন্ত আর কোনো রাস্তা নেই
আমি উড়ে চলেছি মেঘমণ্ডলের ওপর দিয়ে

আর নিচে—নদীর দুপাড়েই
গাদা করা খড়
আর পাংশু বরফ
আর কালো কালো ঘরবাড়ি।

নদীর বাঁকের মুখে
রাস্তার শেষ।
আহ্লাদে আটখানা হওয়া ছোট্ট মাছ
বলতে গেলে দোরগোড়ায়।

মাথা থেকে ওড়না খুলে একটি মেয়ে
নদীর ঐ বাঁকে আমার কাছে আসত,
জল ফেলে জল আনতে যেত
কখনও ঘর মোছা, কখনও অতিথির জন্যে
চা করার ছলে।

যেন ঝাঁঝালো আলোয়
চোখ কুঁচকে
　　　মেয়ে　নিঃশব্দে রাতের গভীরে তাকাল

যখন আঁকড়ে ধরার আর কিছু নেই
আমাকে বাঁচিয়ে দেয় এই—
নদীর পাড়ে
ভারাক্রান্ত খড়ের গাদা।

মেয়েটি ছড়িয়ে দেয় তার বাহুলতা,
আঙুলে মুঠো ক'রে ধরে
　　　গুচ্ছ গুচ্ছ উলুখড়

আহ্লাদে আটখানা হওয়া ছোট্ট মাছ····

···পাইলটের ঠোঁটে স্মিত হাসি।
ছোট্ট প্লেনটা পড়ে গিয়ে চুরমার হল
নদীর বাঁকে॥

কোজাগরী : লায়লাতুল কাদার

জাগরণে যায় বিভাবরী।
আবহে উষ্ণতা
বিছানো ফরাসে বুড়োদের ফিস্‌ফাস।
চাঁদ—যেন বাঁকানো ভুরুতে
অবাক বিস্ময়।
থামালো নদীর খরস্রোতে
হাড়িপাথর।

অজু করে
রাত্রি আর দিন।
আল্লার কাছে মানুষ পৌঁছে দিচ্ছে
যথাবিহিত বাসনা কামনা।
মানুষ ফিরে ফিরে সকাতরে দোয়া করছে
তাদের রাতের ইচ্ছেগুলো যেন পূর্ণ হয়।
লায়লাতুল কাদারের রাত্রে অভাগা মুসলমানেরা
একরত্তি পার্থিব সুখের জন্যে
মোনাজাত করছে।

মাটিতে স্খলিত হচ্ছে দৃষ্টি।
ধূলিকণাগুলো রাস্তায় ভালুকের মতো
গা ছড়িয়ে,
লোকে হেঁটে যায়,
মসজিদের রোদে-পোড়া ইটের দেয়ালগুলো স্তব্ধ।
ধুলোগুলো মসজিদের পাশ কাটায়
যেমন যেমন বছরগুলো যায়।

বাঁকা তরবারির ছায়া ধারণ ক'রে আছে
কুঁকড়ে-যাওয়া মিনার।
ঘাসের মাঝখানে একটা গড়খাই জ্বল জ্বল করছে,
খোলা পাগড়ির গায়ে বুটিদার রেশমের মতন,
আপেল গাছগুলো তাদের শিকড় ধুয়ে নিচ্ছে
পলিতকেশ জলের মধ্যে,
আজ যখন লায়লাতুল কাদারের রাত্রি।

তিনকাল-খোয়ানো এক থুনথুনে বুড়োর মত
শান-বাঁধানো চৌখুপী জাজিমের ওপর আমি ঘুরে বেড়াই
শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলি আর তোমাকে স্বপ্নে দেখি।
আমার ইচ্ছেগুলো, আহা সফল হোক॥

ফাঁসির আগে মহম্মদের মোনাজাত

বিস্‌মিল্লাহ্‌।
দূর অভিযানের মধ্যে নিজেকে আমি ভুলে যাব
লড়াইতে আমি এক বছর আছি
আমার গলা পর্যন্ত অপবাদ
ঘোড়ায় জিন দিয়ে আমার জন্ম
শিকল প'রে আমি মরছি
রাস্তা দিয়ে কুকুরের মত আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে।
ঘোড়ার ঘামের গন্ধ আমি ভুলে যাব।
ধরা গলায় কান্নার শব্দ আমি ভুলে যাব বন্দীশালায়
সকাল হলে আমার দেহটাকে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে
আগুনের কুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলা হবে
আমার মাথার টনক ভুলে যাবে তার অতীতের গৌরব।
আমি ভুলে যাব মেয়েরা আমাকে দেখে কিভাবে আঁতকে উঠত
আমি যেন এক খোলা তরোয়াল,
কিন্তু জং ধ'রে গিয়ে আমাকে খেয়ে নিচ্ছে।
যেন একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে আমার প্রাণপুরুষ
কণ্ঠায় এসে ঠেকেছে।
না, আমি ভুল বললাম—
আমার হৃদয় যেন পালক-ছাড়ানো বাজপাখি।
আমি সমস্তই ভুলে যাব,
আমার প্রার্থনা, আমার মুক্তি,
অগ্নিকুণ্ড, লড়াই, আল্লা…
হে ঈশ্বর।
মরুভূমির শিয়রে চাঁদ উঠছে
আর উটের দল চলেছে পেছনে পেছনে,
একটা মাদী উট বালিয়াড়িগুলো পেরিয়ে
মরুভূমির আঁচে ফুটন্ত দুধ,
নিতান্ত বেজার হয়ে কুকুরগুলো খেয়োখেয়ি করছে

আমি বন্দীশালায়, মাটির নিচে, অনেক গভীরে
আর গোলাকার রুটির মত চাঁদ আমার হাতে
গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে…

অগস্টের এইসব রাত

অগস্টের এই সব রাত,
বিদায় নাও, কিন্তু মনে রেখো
এর চেয়ে ঘনঘোর রাত্রি আর নেই।
আমার কাঁধের ওপর আপেলের একটি পল্লব,
ঠিক চায়েরই মত সুরভিত রাত্রি।

হাঁ করো,
দেখবে তোমার গলায়
চুপি চুপি প্রবাহিত হবে ধারা।
হরিৎ নগরের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় এই প্রহর, সেখানে বয়
আপেল গাছের শাখা,
ওঠানো যবনিকার মত,
কালো আকাশে আগুনের এক শিখা।
আমি ভুরু কোঁচকাই আর মনে করতে চেষ্টা করি
সেই গ্রহের নাম।
মঙ্গল। মঙ্গল না হয়েই যায় না।

আস্তাবলের তেজী ঘোড়া আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে,
আমার বিশ্বস্ত জুলবার
তার লোহার লাগাম ঝুন্ ঝুন্ ক'রে বাজিয়েছে
ধূলিধূসর সফরের পর।
শ্রান্তি নিদ্রতা ঘুম

ঊর্ধ্বে নক্ষত্র গম্বুজ,
গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া শিরস্ত্রাণের মত,
তার উজ্জ্বলতম নক্ষত্রকে ঝলকিত ক'রে
মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে—
মঙ্গল। মঙ্গল না হয়েই যায় না!

পাকা টসটসে স্বচ্ছ ফল
নুয়ে পড়ে আপেলগাছের ডালটাকে চাপ দেয়,
ভাঙে।
আর সমানে নুইয়ে দিতে থাকে
অগস্টের এইসব রাত,
বিদায় নাও, কিন্তু মনে রেখো
এর চেয়ে লঘুভার রাত্রি আর নেই,
কত কিছু রয়েছে যা এখনও আমার জানার বাইরে,
ঠিক চায়েরই মত সুরভিত রাত্রি।

ঘন ঘাসে নিক্ষিপ্ত
একটা জরাজীর্ণ আজিম,
আলুবোখারা গাছের পেছনে অন্ধকার
কালো তেজী ঘোড়ার মতন দাঁড়িয়ে,
জিনের ওপর মাথা রাখা···জিন থেকে বেরোবে
ঘাম আর ধুলোর বোটকা গন্ধ···
আর আমার তলা থেকে উঠে আসছে
একটি দলিত মথিত উদ্ভিন্ন অঙ্কুর॥

মরুভূমিতে রাত্রি

শিশির নেই,
আশ্চর্যের কথা, শিশিরই নেই,
অসাব্যস্ত, ঠাণ্ডা বালিতে,
আমার মুখমণ্ডলে আর আমার কুর্তায়—

শিশির নেই,
চূর্ণিত পাথরের তরঙ্গমালা
ঠিক যেন প্রহরীর মতই চুপচাপ,
আর এক রাতদুপুরের চাঁদের
আলোয় জ্বলছে।

হায়, শিশির নেই।
খালি পায়ে শেয়ালের বালির মধ্যে হাসছে,
শিশির নেই ব'লে,
গায়ে আলো পড়ে এক কঙ্কালসার গাছ পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে

শিশির নেই ব'লে।
অ্যালুমিনিয়াম আলোয় অনাবৃত হয়
মরুভূমির উদ্‌গত স্তনযুগ
আর এক ফোঁটা শিশিরের জন্যে
বালিয়াড়ির কাতর প্রতীক্ষার চেয়ে বড় মানবিক
সৌন্দর্য আর নেই।

চাঁদ জুড়িয়ে আসবে
আর বালিয়াড়ির দূরের কিনার
সূর্যালোকে ফেটে পড়বে...
কিসের জন্যে?
নিঃসঙ্গ মানুষের মুখমণ্ডলে শিশির।

কথাটি

এক সুরাইতে ঢেলে দেওয়া তরল
চটপট বরণ করছে তার কঠিন ছাঁদ।
আত্মার বনগহনে নিবিষ্ট শব্দ
তাকে তার নিজের ছাঁদে ঢেলে সাজে।
রাতের গড়নে যা নয় তাই হয় অন্ধকার
আর অতীত থেকে আসে ছেঁদো ঘোড়া নয় তেজী ঘোড়ার হ্রেষারব।
সব জায়গাতেই ভয়াবহ সামঞ্জস্যের সমস্ত কাঠামো
চিৎকার ক'রে ভাঙার একটা প্রবল স্পৃহা।
এমনি ক'রে পৃথিবীতে ঢুকে আমরা পৃথিবীকে বদলাই।
পৃথিবী ওপরের খোলস, আমরা তার ভেতরের শাঁস।
কম্পমান ঈথারের মত দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে
শব্দের কলেবর নিচ্ছে পৃথিবী।
শেষ পুঁথি এখন ভস্মকায়, আর স্ফুলিঙ্গে ছেয়ে গেছে ধোঁয়া
কিন্তু অক্ষরগুলোর ছাইয়ের ওপর চিরন্তনের চিহ্ন
কঠিন প্রস্তরফলকে—
সেই ধ্বনি
চিন্তার নক্সায় উৎকীর্ণ ॥

বিলম্বিত

ট্রেনগুলো যে সময়ে আসবার আসে নি।
সবুজ সিগন্যাল দুর্ঘটনায় ঠাসা।
গুলিতে ভূপাতিত পাঁশুটে নক্ষত্র
প্লেনগুলো বিলম্বিত।

বাদামী চোখের ওপর তেরছা ভুরু—
দয়ার সাগর এই শতাব্দীর, মরি মরি, কী কেরামত!
মাত্র এক চাবুকপ্রমাণ দেরি ক'রে ফেলেছে
তোমার মন্ত্রণা।

অনেক ছবির রং চটিয়ে দিয়ে
পড়বে ভবিষ্যতের ছায়া।
ওগো প্রিয়া, তোমার পেলবতা
বড় দীর্ঘদিন দেরি ক'রে ফেলেছে।

পিয়ানোকে দাবড়াও। ওরা বাবা রে মা-রে করবে।
মহাকাব্য থেকে ছিটকে উঠে আসবে
পরিত্রাতা অশ্বারোহীর দল—ইতিহাসের চেয়েও দ্রুতবেগে
—এসে দেখবে ওরা দেরি ক'রে ফেলেছে
বছর শ' তিনেক॥

বিজ্ঞান, ধর্ম আর সৌন্দর্য বিষয়ে

মানছি
ধর্ম টানে সৌন্দর্যের দৌলতে—
রঙীন রঙীন কাঁচ, খোদাই-করা মূর্তি,
উঁচু উঁচু গম্বুজ,
নীলে নীলাকার মিনার, অক্ষয় অমলিন জলরং।
শত শত জেহাদেও
ইসলামের যে জয় সম্ভব হয় নি
তা হয়েছে একটিমাত্র অপরাজেয় আয়া-সুফিয়ায়।
তরোয়াল দিয়ে নোয়ানো যায় মাথা,
আত্মাগুলোকে হাত করায় আয়া-সুফিয়া,
নিষ্ঠুরতা গায়ের জোরে স্বীকার করায় বশ্যতা।
পটাবার জন্যে রয়েছে সৌন্দর্য।
মসজিদ জাগাবে সম্ভ্রম
তরোয়াল যোগাবে ভক্তি—
মারমুখো বিশ্বাসের এই হল আদত
চাঁদতারাকে আর চালচুলোকে এক জায়গায় এনে
দ্যুলোক আর ভূলোক মিলিয়ে দিয়ে
তরোয়ালে আর মসজিদে এক মিতালি।
মানছি।
কিন্তু ওসব প্রতীকে আর চলছে না,
সময় হয়েছে এখন ওদের আঁস্তাকুড়ে যাবার,
কিন্তু তবু ওরা বস্তুতে বস্তুতে আঠার মত লেগে,
মনগুলোতে তবু ওরা গেড়ে বসে আছে।
দেবলোকে উঠে গেল কোথাকার এক আড়কাঠ
—ক্রসচিহ্নাকারে
কোথাকার এক খঞ্জর অর্ধচন্দ্রাকারে।
রাগ হবে না ?
যুগটা পারমাণবিক আর ধর্মের প্রতীকগুলো

যেন সেই কোন্
আদমের সময়কার স্মৃতিচিহ্ন
মিনারের আদরার সঙ্গে
ক্ষেপণযোগ্য একটি রকেটকে একবার মেলাও।
রকেট মিশে আছে শক্তি আর সৌন্দর্য,
এখানেই তো পেয়ে গেলে তোমার যোগ্য প্রতীক।
ভেতরে এক গোলমুখো দেবতার অধিষ্ঠান,
তার বেশ আঁটসাট মাংসপেশী
আর প্রথম শ্রেণীর রক্ত।
আজ দেবতা বনতে পারে যে কেউ—
ওঁরা বলেন, তার জন্যে চাই যুৎসই স্বাস্থ্য।

মধ্য রাত্রে
কারো পিঠ বেয়ে পিঁপড়েরা যেমন বেড়ায়
তেমনিভাবে সেই দেবতারা চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটে
সেই বিগ্রহ।
ঠাকুরের সাদাসিধে ভাবে কেউ বিমুখ তো হয় না,
সাদা সফেদ শয্যাতেই তো আমার প্রেয়সীকে ঢের ভাল দেখায়।
জীবনের সমস্ত নোংরা নিয়ে
সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে,
আমি উচ্চারণ করি আমার প্রার্থনা,
প্রেমই আমার ধর্ম।
ধুলোর মতন রেণু রেণু হয়ে জমবে
পুরুষের পর পুরুষ, কালের পর কাল, কল্পের পর কল্প
যতদিন বিরাজ করবে ভালবাসার এই ধর্ম,
যতদিন ভেনাসের শরীরের ঢেউগুলো মারাত্মক হয়ে থাকবে।
তামাকের একরাশ ধোঁয়ায়, দেখ
বুড়োর দল কি রকম আড়চোখে ঠাকরুনকে দেখতে দেখতে ভাবছে
উনি নিষ্প্রাণ মানুষ, এই মাটির পৃথিবীর,
বিশেষ ক'রে,

শরীরের ঐ বঙ্কিম ঠাম...
কিন্তু তা সত্ত্বেও, গির্জাগুলোতে ঢুঁ না দেওয়াই ভাল,
যেখানে রঙীন কাঁচ ভেদ ক'রে সূর্যের রশ্মিগুলো
খ্রীস্টের বক্ষপঞ্জরের ওপর দিয়ে রক্তের ধারার মত বইছে,
সায়ংকালের প্যাগোডার মতন
যেখানে নৈঃশব্দ্য,
ভোরবেলার মসজিদের মতন
যেখানে উত্তুঙ্গ মহিমা।...
এই সৌন্দর্য হরণ ক'রে নেয় ধর্মে বিশ্বাস॥

পদার্থবিদের প্রার্থনা

ফেব্রুয়ারিতে (হ্যাঁ, আমার মনে হয় ফেব্রুয়ারিতে) মরুভূমি
হয়ে যায় লালে লাল সমুদ্র। পপিফুলে।
মার্চে ঘাসে ঘাসে ঢাকা থাকে বালি,
উটের যে কাঁটা, তাও তখনও ঠিক কাঁটা নয়—
নরম, সবুজ আর তার থলথলে পাতাগুলো
ভেঙে গেলে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে শিশির।
যে মাসে রৌদ্রতাপে দগ্ধ ঘাস বালিতে মিলিয়ে যায়
আর গরম ধুলোয়
ঢের বেশী ক'রে দেখা যায় ভেড়ার নাদি।
আর অগভীর বাটিতে
শুধু সবুজ চা
স্মরণ না করার কথা
আমাকে মনে করিয়ে দেয়।
আর সেই সঙ্গে শুকনো কুয়োর তলানিতে ঠেকা
কালো জল
আমাকে মনে করিয়ে দেয়

চরাচর হলুদবর্ণ
আর টকটকে লাল।

ঠোঁটটাকে স্বাগত জানাবার ভঙ্গিতে নেড়ে নেড়ে
এক বাদামী ঈগল শূন্যে ভেসে আছে।
আমি ফিরে এসেছি, আমার পুনরধিকারে
আমার এই ভূমণ্ডল, আমার ভালবাসার জগৎ।
নিশ্চল সাপ গদ্‌গদ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে :
কুঁকড়ে গেছে লজ্জায়।
মাঠ, তুমি কেমন আছ!
প্রত্যেকটা নেংটি ইঁদুর আমার জন্যে
তার জীবন আর স্বাধীনতা
হাসিমুখে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।
এখানে সকলেই কুশীলব,
সকলেরই স্থান মঞ্চে।
একটা চড়াইও জানে
তাকে ছাড়া এ পৃথিবী অসম্পূর্ণ।
গুবরেপোকাও মানিয়ে যায়।
পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে সে হাঁটে,
গোময়ে তার প্রাণধারণ,
সে ভালবাসা পায়,
তাকে দেখা হয় না ঘৃণার চোখে
পায়ের নিচে কেউ যদি তাকে মাড়িয়ে দেয়
তাহলে তা হঠাৎ দৈবাৎ।
বিনা মদিরায় এখানে শান্তি মেলে,
অতীতকে নাকচ করতে হয় না।
শব্দ আর শ্রুতি হয়ে সময়ের পর্বগুলো এখানে এসে মেলে
তারপর অনাদি-অনন্তে মিশে যায়।
তাড়া না করার ধর্মকে

লগির জোরে অমর করে রেখেছে বালুতট,
এখানে এলে টনক নড়ে :
দার্শনিক জেনো বলেছিলেন ঠিক—
কচ্ছপের পিছু নিয়ে কখনই আমরা তাকে ধরতে পারব না
সুতরাং : বেঁচে থাকো আর ঘুমোও, হে—
তোমার যা প্রশ্ন আছে কারো, সময় হলে উত্তর পাবে ;
কাল অনন্ত, তাকে তাড়া ক'রো না।
সরলরেখা হল
অনন্তে প্রসারিত শুদ্ধমাত্র সংখ্যা।
পরম জ্যামিতিক চিত্রসমূহের যোগফল দিয়ে
বৃত্তকে পরিমাপ করতে যেয়ো না,
আর বুঝে ফেলতে চেয়ো না সব কিছু
কেননা তাতে সব কিছুই অর্থ হারায়।
যুগ যুগ সঞ্চিত অশ্রুর বাষ্পে,
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সঞ্চিত ধুলির আবরণে
বাস্তব থেকে আমাদের ঠিক শিক্ষাটি হয় নি,
আমাদের মাথা খেয়েছে রূপকথা।

ওভার পেরিয়েও অনেক ট্রেন আছে।
তার একটি হল আমার বিষাদ।
প্রকৃতির ধর্মের দরুনই হোক,
কিংবা দুর্ঘটনাক্রমেই হোক,
হে ঈশ্বর, তুমি দেখো
যেন আমার দেরি হয়ে না যায়।
ঈশ্বর, দেখো
আমি যেন সব কিছু বুঝে না ফেলি,
আর সে সুরোদ যদি তোমার না থাকে—
ঈশ্বর,
আমাকে মাপ ক'রো ॥

হে পর্বতমালা

হে পর্বতমালা, তুমি কি আমাকে ভালবাসো ?
পাইনগাছ, ভালবাসো ?
নীল আর সাদা পোশাকে
বছরগুলো আমার ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে,
সঙ্গে নিয়ে কত সব মূল্যবান
ওষধির নাম,
চড়া চড়া রঙের মধ্যে শুষে নিয়ে
সকল ছাঁদের নৈঃশব্দ্য।
পাহাড়গুলোকে একজোড়া দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মত ব্যবহার ক'রে
আকাট বাস্তবতাকে আমি শুধ্‌রে নিই—
আমি ভ্রমণ করেছি তুষার-সম্প্রপাতের মত
আর আমার বছরগুলোর
    দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পদাঙ্কে জমেছে
তুষারের ধূলিকণা।
উল্কার নামাঙ্ক
বিভ্রমের বছরগুলো।
হে পর্বতমালা, তুমি কি আমাকে ভালবাসো ?
মানুষের জাত, আমাকে ভালবাসো ?
তোমার ভুল কখনও শোধরানো যাবে না,
তোমাকে কখনও সমান করা যাবে না,
তোমার বন্ধুরতাকে,
হে পর্বতমালা,
কখনও চেঁছে ফেলা যাবে না।
তোমার নিয়মের কোনো বালাই নেই, হে পর্বতমালা,
তোমার কোনো ধারণাই নেই বিধিনিয়মের,
তোমাকে কেটে সমান করা যাবে না, হে পর্বতমালা,
কেননা তোমার সমান স্তরের কিছুই নেই।

যায় আসে

আকাশে পাখির ঝাঁক
উড়ে যায়
নিচে শুভ্র নদী,
যেন দগ্ধ গ্রীষ্ম দিল অন্তরীক্ষে ছুঁড়ে
কালো ছাই,
বলাকা উড্ডীন, যেন শূন্যে যায় ভেসে
কারো চুল বাঁধবার ফিতে,
আমার হাঁসেরা যায়
যেখানে চেয়েছে তারা যেতে।
মিষ্টি এঁটেল মাটি, লবণাক্ত হ্রদ,
আফ্রিকার মাছ, কিন্তু তেতো নয়,
গায়ে নেই কাঁটা।
আমার কেমন যেন মনে হয়—
মন্থর হাঁসের ঝাঁক নিয়ে
নদীতে নদীতে ফেলে মুক্তাবর্ণ পাশুটে পালক
রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে যেন সুবচনী
আমার কেবল ভয়—
হয়ত এলিয়ে পড়বে ডানা,
হয়ত বা থেকে যাবে নিরবধি অন্তহীন কাল
যেখানে যাবার জন্যে বাসনা আমার।
হয়ত আছে বাসনা আমার।
...উঠে আসে পাহাড়ের মাথার ওপর
এলে মধুমাস,
যেন ভারাতুর রশ্মি,
সূচীমুখে প্রথম প্রবেশ,
জোর ক'রে ঠেলে ঠেলে অবসন্ন জলবায়ু-জর্জরিত তাদের ডানায়
ঈষদচ্ছ, সান্দ্র সেই
বায়ুর স্রবণ॥

পদচিহ্ন

পায়ের
　　এই ছাপ
　　　　তোমার না হয়েই যায় না।
হাজারটা পায়ের ছাপ মরতে কেনই বা পড়বে।
ধবধব করছে রাস্তা, তার ওপর দাগ,
আমার নোটখাতার মার্জিনে কলম বোলানোর মত।
…আমি রাত্তিরে যেসব সাংঘাতিক ভুল ক'রে বসি, তার চিহ্ন,
মার-খাওয়া মুখের কালো আর নীল কালশিটের মত।…
প্রিয় মুখ হাজার ভিড়ের মধ্যেও আমি ঠিক খুঁজে নেব,
অভিধান ঘেঁটে আমি খুঁজে বার করব ভাল ভাল কথা,
আমি তাদের শিকারী কুকুরের মতন পাদস্পৃষ্ট রাস্তা দিয়ে
　　　　　　　　হাঁটিয়ে নিয়ে যাব
গ্রামদেশের অমলিন তুষারের দিকে,
নগরের সেই উপান্ত পার হয়ে,
যেখানে শোনা যায় না কোনো হীন কটুকাটব্য,
যেখানে তুষারে মুদ্রিত ছাপ আহাম্মকেরা এখনও পড়ে ফেলে নি।
লাল খেঁকশেয়ালী হয়ে হয়ত তুমি চলে গিয়েছিলে পাহাড়ে?
হয়ত নীল নেকড়ে হয়ে গিয়েছিলে মরুভূমিতে?
নাকি তুমি সাদা তিতির হয়ে গিয়ে
তুষারে ছড়িয়ে ছিলে ঢ্যারাচিহ্ন?
সীমান্ত পেরিয়ে তুমি উড়ে গিয়েছিলে কি
চীনদেশের ঘননিবিড় কাঁটাবনে?
কিন্তু মুদ্রিত ঢ্যারাচিহ্নগুলো
কত শিখর, কত গহ্বর, কত পাহাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে –
কাকেরা নিশ্চয়ই এই ঠেসে-ধরা, চোট-খাওয়া তুষারে
এই প্রান্তরকে চিহ্নিত করেছে।
আমি কাকদের সেই ঢ্যারাচিহ্নগুলোকে বার বার জিগ্যেস করেছি

তারা তোমার কথা কিছু জানে কিনা।
আমি উত্তর পেয়েছি :
'না।'
আকাশ বর্ষণ করছে তুষার।
কোনো পদচিহ্নই এই তুষারে থাকার নয়॥

বিড় বিড় ক'রে আওড়াচ্ছে পদ্য···

মানবিক ক্রিয়ার মন্থর অনুধ্যান হল শব্দ,
ভাষা ফুটে বেরোয় খাড়াই বেধ আর বর্ণ নিয়ে।
যেমন একটা গরাস, তেমনি একটা সজোরে ঘা,
আর একটা স্মিত হাসি,
আর শত শত বছর ধ'রে পায়ের পেটানোর আওয়াজ
আর আঙুরলতার একটা হেলে-পড়া ভাব :
সমস্তই পুনরাবৃত্ত হবে শব্দে।
আমি পুনর্বার এই কালো রাত্রিকে
আমার শাগ্‌রেদ ব'লে স্বীকার করছি।
এই রাত্রে আমি উপলব্ধি করেছিলাম চাঁদের অস্ফুট স্বগতোক্তি।
আর গলা বেয়ে উঠে এসে
একগুচ্ছ শুভ্র শব্দ
এমনভাবে লাল জিহ্বার দিকে যাবার জন্যে
ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি করছিল
যেন তারা আলোর দিকে যাবার জন্যে ব্যস্ত।
এখুনি আমি তার স্বরে চিৎকার করে উঠব:
পেয়েছি। পেয়েছি।
আমি সকলের কাছে রাষ্ট্র ক'রে দিতে চাই।
দর্পণের ছায়ায়
এই চাঁদ গণনা করবে ভাগ্য।
নিক্ষিপ্ত জমির দুরাগত বালকের মত

এই অনচ্ছ আলো
উলঙ্গ ক'রে দেয় আমার মুখ,
বছরের পর বছর সে জ্বালা জুড়োয় না।
আহাম্মকদের কাছে করুণা না চেয়ে,
আক্কেলমন্তদের আদেশ শিরোধার্য না ক'রে
স্তেপ্‌ভূমিতে টো টো ক'রে ঘুরছে শব্দ
যদি দৈবাৎ আমার দেখা পায়।
…বিড় বিড় ক'রে সে আওড়াচ্ছে পদ্য। কুর্দরা ঠিক এইভাবেই
উচ্চারণ করে তাদের প্রার্থনা।
ধিকি ধিকি আগুনের ছায়া পড়েছে তার গালের হাড়-উঁচু-করা মুখে॥

রে তিমুর খান, লোহায় তৈরি খঞ্জ

আমার আছে দুই তুমেন* সৈন্য
তোমার আছে এক কুড়ি দুই।
চীনা ভিক্ষু মু চিন তাঁর সম্রাটের কাছ থেকে
আমার জন্যে আনছিলেন ভেট।

সোনালি জরি দিয়ে বোনা দুটো গালচে,
দুটো নাকাড়া
আর পান্না-বসানো একটা তরোয়াল।
তুমি পুড়িয়ে ছাই করেছ আলমা-তাউ,
আমার শ্বেতপক্ষ প্রাসাদ লুটিয়ে গেছে ধুলোয়।

তোমার পল্টনে তুমি জুটিয়ে নিয়েছ আমার লোকজন,
আমার কাছে পড়ে রয়েছে আর মাত্র দু তুমেন।
চীনা ভিক্ষু মু চিন
আমাকে দিয়েছিলেন দুটি নাকাড়া আর তাঁর করুণা।

---

* তুমেন—হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী

আমি তাঁকে পুঁতে ফেলার হুকুম জারী করেছিলাম।
তিমুর, যদি সাহস থাকে তো এসো লড়ে যাও,
খোঁড়া কুত্তা, তোমাকে আমি কচু-কাটা করব,
তুমি হলে লোহার তৈরি খঞ্জ,
কিন্তু আমার তরোয়াল ইস্পাতের।
এক খাপে দুটো তরোয়াল
কখনও আঁটে না।
দুই রথী কখনও বাঁচতে পারে না
শান্তিতে।
তোমার চর্বি আমি মাখিয়ে নেব আমার তরোয়ালে,
তোমার চামড়া দিয়ে ঘোড়ার গায়ের চমৎকার ঢাকা হবে।

আমি কালো ঘূর্ণীঝড়ের মত দেখা দেব তোমার জনপদে,
আমার হাঁটু ছাড়িয়ে যারই মাথা উঠবে,
ইতিহাসে তাকেই বিদায় নিতে হবে
টগবগিয়ে ছুটে আমি ধ'রে ফেলব তোমার মেয়ে বুলবুলকে
আমি তাকে ছিনিয়ে এনে
ছাইগাদায় ফেলে
ধর্ষণ করব!

ক্ষেপেছ?
না, বুলবুল—
বিধ্বস্ত আলমা-তাউয়ে আর আমি থাকব না,
দরিদ্রতম পাড়াগাঁয় চলে যাব
আর সেখানে গিয়ে আমার ছোট্ট ক্ষেতি-বাড়িতে করব জোয়ারের চাষ॥

নিউ ইয়র্কে বৃষ্টি

হাওয়া নেই।   লোক গিজ গিজ করছে। জুলাই।
কংক্রিটের গায়ে নেই-আঁকড়া বৃষ্টি,
শার্সিতে রাং-ঝালাই করছে লম্বা লম্বা হল্‌দে কালি।
শহরটা মুখ বুঁজে জল ভাঙছে।
হাঁটুজল হাডসন।
        মোড়ে হেলান দিয়ে
মুখ মুছছে শহর।

লোকে যেমন ঘোড়ার দাঁত দেখে,
তেমনি ক'রে আমি খুঁটিয়ে খুটিয়ে এই শহরকে দেখছি।
আমার জানলা আঁচড়াচ্ছে
ঐ সব লম্বা লম্বা হল্‌দে কালি।
একটু হেঁটে আসা যাক। ব'লে আমি বেরিয়ে পড়ি।
পার্ট এভিনিউতে বৃষ্টি।
আমি তোমাদের অতিথি।
তোমরা ভিজে গেছ।
আমিও ভিজব।
হাওয়া নেই।
অঝোরে বৃষ্টি।
হাঁটু অবধি জল ঠেলে চলেছি।
কাদাগোলা নদী উঠে আসতে চাইছে
                আমার কোলে।
মরুভূমির নদী
ইটের দালানকোঠার মধ্যে ওর বড় একা একা লাগে।
—আমেরিকা!
ও কি তুমি, এইটুকু শিখা,
ছায়াচ্ছন্ন পদতলে?
—আর তুমি স্বয়ং? কে তুমি?

আমি চুপচাপ, গাড়ির লাশগুলোর পেছন দিয়ে
আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি রাস্তা।
হলুদবর্ণ দিন। বৃষ্টি। বালির ঢল।
শেষ পর্যন্ত আমি পৌঁছোই
হোটেলের গাড়িবারান্দায়।
মেয়েদের চিলচিৎকারের মধ্যে
সবেগে হলুদবর্ণ কাদা পেরিয়ে
গাড়িগুলো পৌঁছে যাচ্ছে শক্ত জমিতে।
তারপর হাঁসের মত গা থেকে ঝেড়ে ফেলে জল।
বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টইটম্বুর হাওয়া।
মুষলধারায় বৃষ্টি আমার চোখমুখে
যেন জুতোপেটা করছে।
একটা নীল বেড়াল ঢেউয়ের মতন
জল ছেটাচ্ছে।
রাস্তার হলুদে ঘোলা জলে
নীল সমুদ্রের তরঙ্গ ॥

